নোবেলের তিনকাহন - ২০১৫

সু ম ন পা ল

আলফ্রেড নোবেলের জীবন ও কর্ম (নোবেল পুরস্কার-এর ইতিহাস)

২১শে অক্টোবর ১৮৩৩, আলফ্রেড সুইডেনের স্টকহোমে একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ইমানুয়েল নোবেল ও মায়ের নাম অ্যান্দ্রিয়েতে নোবেল। আলফ্রেডের বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং উদ্ভাবক ছিলেন। তিনি সেতু এবং ভবন নির্মানের স্কেচ করতেন। যে বছর আলফ্রেড জন্মেছিলেন ঐ বছরই তাঁর বাবার ব্যবসার ক্ষতি হয় ও তা বন্ধও করে দিতে হয়েছিল। তখন ইমানুয়েল অন্য কোথাও তাঁর ব্যবসাকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবেন এবং ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আলফ্রেড এবং তাঁর পরিবার-এর যত্ন নিতে তাঁর মা স্টকহোমে থেকে যান। অ্যান্দ্রিয়েতে, যিনি একটি ধনী পরিবার থেকে এসেছিলেন, তিনি একটি মুদি দোকান শুরু করেন; যেখান থেকে একটা মোটামুটি আয় হয় এবং পরিবারের দিন গুজরান হতে থাকে।

বেশ কিছুদিন পরে, রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ইমানুয়েলের ব্যবসা খুব জমে ওঠে; তিনি রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য সরঞ্জাম প্রদানকারী একটি যান্ত্রিক কর্মশালা গড়েন। রাশিয়ায় তাঁর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে, ইমানুয়েল ১৮৪২-এ সেন্ট পিটার্সবার্গে তার পরিবারকে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। সেখানেই গৃহশিক্ষকদের সাহায্যে অন্য ভাইদের সঙ্গে আলফ্রেডকেও বেসরকারী প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের পাঠ ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য। মাত্র ১৭ বছর বয়সে, আলফ্রেড সুইডিশ, রাশিয়ান, ফরাসি, ইংরেজি এবং জার্মান ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে পটু হয়ে উঠেছিলেন। আলফ্রেডের সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল সাহিত্য, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে। আলফ্রেড পরবর্তী কালে একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়েছিলেন এবং নোবেল পুরস্কার চালু করেছিলেন। তিনি অনেক কবিতা ও নাটক লিখেছেন। তাঁর সামাজিক ও শান্তি-সংক্রান্ত বিষয়েও খুব আগ্রহ ছিল। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন যে তার ছেলেরা তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করুক। কবিতায় আলফ্রেডের আগ্রহ দেখে তিনি খুশি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ার হোক; সেজন্য আলফ্রেডকে অধ্যয়ন করাতে বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্যারিসে আলফ্রেড বিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক টি জে পেলওউজ-এর ব্যক্তিগত গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পান। সেখানে তিনি একজন অল্প বয়স্ক ইতালীয় রসায়নবিদ, এ সবরেরো-র দেখা পান যিনি কিনা তিন বছর আগে নাইট্রোগ্লিস্যারীন নামক একটি অত্যন্ত বিস্ফোরক তরল আবিষ্কার করেছিলেন। বাস্তবে এর ব্যবহার খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু, আলফ্রেড নাইট্রোগ্লিস্যারীন সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং কিভাবে এটা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে তিনি তাঁর পড়াশুনা শুরু করেন। পড়াশুনা শেষে রাশিয়া ফিরে এসে, নাইট্রোগ্লিস্যারীনকে একটি বাণিজ্যিকভাবে এবং প্রযুক্তিগতভাবে দরকারী বিস্ফোরক হিসেবে কি করে কাজে লাগানো যায় তার জন্য বাবার সাথে একসঙ্গে কাজ শুরু করেন।

পরবর্তীতে আলফ্রেড সুইডেনে ফিরে এসে নাইট্রোগ্লিস্যারীনকে একটি বিস্ফোরক হিসেবে উন্নীতকরনে মনোনিবেশ করেন। দুঃখের বিষয় যে, এই পরীক্ষা করাকালীন একটি দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাতে আলফ্রেডের ছোট ভাই সহ কয়েকজন মারা যান। ফলে, সরকার স্টকহোম শহরের সীমার মধ্যে এই পরীক্ষাগুলি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আলফ্রেডের গবেষণা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাতেও এই বিজ্ঞানসাধককে দমিয়ে রাখা যায়নি। তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও। তিনি তরল নাইট্রোগ্লিস্যারীন-এর সাথে kieselguhr নামক একধরণের সূক্ষ্ম বালি মিশিয়ে লেই তৈরি করতে সক্ষম হন এবং সেগুলোকে বেলনাকার রডের আকৃতি দেন। এগুলোকে গর্ত খনন করে ঢোকানো যেতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একটি ডেটোনেটর-এর সাহায্যে বিস্ফোরন ঘটানো যেতে পারে। তিনি এর নাম দেন 'ডিনামাইট'। ১৮৬৬ সালে তিনি এর পেটেন্ট বা মালিকানার আইনি অধিকার লাভ করেন। তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কার সেতু নির্মাণের, পাহাড় ভাঙ্গনের, টানেল খননের মত অনেক নির্মাণ কাজের খরচ বিপুল পরিমাণে কমাতে সাহায্য করেছিল। ফলতঃ 'ডিনামাইট' এবং 'ডেটোনেটর'-এর চাহিদা নির্মাণ শিল্পে প্রচুর বেড়ে যায়। এরই হাত ধরে আলফ্রেড ইউরোপ-এর ২০ টিরও বেশি দেশে ৯০ টিরও বেশি শহরে কারখানা তৈরি করেন এবং 'ইউরোপ-এর ধনী ভবঘুরে' নামে আখ্যায়িত হন। এরপরেও তিনি সিন্থেটিক রাবার, চামড়া, কৃত্রিম রেশম এবং আরও নানান বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। মৃত্যুর সময় তাঁর পেটেন্ট সংখ্যা ছিল ৩৫৫ টি। বলাই বাহুল্য যে, তিনি পরিণত বয়সে প্রভূত ধনশালী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে তাঁর আয়ের সিংহভাগ এমন একটি কাজে দান করে গেলেন যা সারা বিশ্বকে আজও অবাক করে। মানবকল্যাণের জন্য যারা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিজ্ঞান,

চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শান্তি এই পাঁচটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন তাদের প্রতি বছর পুরস্কৃত করা হবে। এর নাম হ'ল নোবেল পুরস্কার যা ১৯০১ সাল থেকে প্রতি বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া হচ্ছে।

এই বিজ্ঞানসাধক মহামানব-এর ১০ ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬ তারিখে ইতালির সান রেমো শহরে মৃত্যু হয়।

নোবেল পুরস্কার

নোবেল পুরস্কারের বর্তমান আর্থিক মূল্য প্রায় ৯ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ছ' কোটি টাকা। এর সঙ্গে একটি সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা। নোবেল মেডেল যথেষ্ট ওজনদারও বটে। আর্থিক মূল্যের নিরিখে ১৫০ গ্রাম ওজনের ১৮ ক্যারাট সোনার এই মেডেলের বর্তমান বাজারদর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিবিদ্যা-তেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। অক্টোবর মাস নাগাদ প্রক্রিয়াটি নোবেল কমিটি সম্পন্ন করে এবং আলফ্রেড নোবেলের প্রয়াণ দিবস ১০ ই ডিসেম্বর প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

প্রথা হ'ল, প্রতি বছর নোবেল কমিটি চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করে। চলতি বছরে পরজীবী সংক্রান্ত রোগের নিরাময়ে নজিরবিহীন যুগান্তকারী গবেষণার জন্য তিন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন, চিনা গবেষক

ইউইউ তু, জাপানি বিজ্ঞানী সাতোশি ওমুরা এবং আইরিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। তু ২০০০ সাল থেকে চিনের অ্যাকাডেমি অফ ট্র্যাডিশন্যাল চাইনিজ মেডিসিনের প্রধান গবেষক। তিনিই চিনের প্রথম মহিলা যিনি বিজ্ঞান বিভাগে এই পুরস্কার পেলেন। বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া ওষুধের সাহায্যে ম্যালেরিয়া ও গোলকৃমির মতো পরজীবী-ঘটিত রোগের নিরাময় নিয়ে গত ৪৫ বছর ধরে গবেষণা করছেন তিনি। তাঁর চেষ্টা ছিল চিনের এক গুল্ম থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরি করা। শেষ পর্যন্ত সফলও হন তু। সরাসরি গাছ থেকে পাওয়া বলে তু-র আবিষ্কার করা ওষুধের কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে না। তু ইউ ইউ-র বের করা ওষুধ চিনে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যাকে এক ধাক্কায় অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছে। ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী *Plasmodium falciparum* পরজীবী ক্লোরোকুইন, কুইনাইন জাতীয় ওষুধের বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু, তু-র আবিষ্কার করা আর্টেমিসিনিন এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর্টেমেসিয়া অ্যানুয়া নামক গাছ থেকে তিনি এটি তৈরি করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ২০ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এঁদের মধ্যে বছরে গড়ে অন্তত ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়। ম্যালেরিয়ায় যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী শিশু। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বহু দিনের। আর এর ওপরই আলোকপাত করল তু-এর গবেষণা। নোবেল কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী ২০১৫ সালের

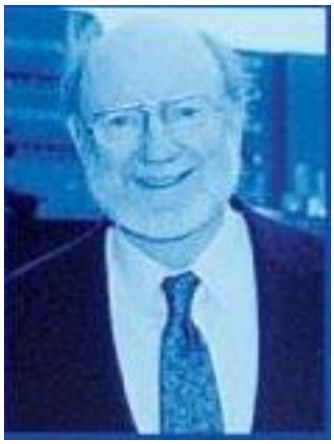

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের অর্ধেক মূল্যই পাচ্ছেন তু।

এই পুরস্কারের বাকি অংশ সমান ভাগে ভাগ করে পাচ্ছেন বাকি দুই পরজীবী বিশেষজ্ঞ। আমেরিকার ড্রিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ও টোকিয়োর কিতাসাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতোশি ওমুরা সারা জীবন গবেষণা চালিয়েছেন গোদ, গোলকৃমি, রিভার ব্লাইন্ডনেসের মতো যে রোগগুলি পরজীবীর আক্রমণে হয়ে থাকে সেই রোগ প্রতিরোধ করার দাওয়াই বের করার জন্য। এক বিশেষ ধরণের মাছি ব্ল্যাক ফ্লাই-র কামড়ে প্রধানত আফ্রিকার বাসিন্দাদের রিভার ব্লাইন্ডনেস নামের অসুখটি হয়। নদীতে স্নান করতে নেমে সংক্রমিত মাছির কামড়ে প্রথমে চামড়ার বিকৃতি ও পরে অন্ধত্ব দেখা দেয় আক্রান্ত ব্যক্তিদের। *Onchocerca volvulus* পরজীবী এই অসুখটির জন্য দায়ী। *Filarioidea sp* টাইপ-এর পরজীবী

আক্রান্ত মশার কামড়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের শরীরে গোদ সংক্রমিত হওয়ার নজিরও নতুন কিছু নয়। হাত-পা, শরীরের নিম্নাঙ্গ অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এই লিম্ফাটিক ফাইলেরিয়াসিস রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতেই গবেষণাগারে স্ট্রেপটোমাইসিস ব্যাকটিরিয়ার একটি বিশেষ প্রজাতি তৈরি করার গবেষণা করছিলেন ওমুরো। তাঁর কালচার করা ব্যাকটিরিয়া *Streptomyces avermitilis* থেকেই অ্যাভারমেকটিন নামে এমন এক ওষুধ তৈরি করেন ক্যাম্পবেল যা এই পরজীবীগুলি প্রতিরোধে সক্ষম। তিনি গৃহপালিত পশুদের ওপর এই ওষুধ প্রয়োগ করেন এবং প্রয়োজনীয় পরিমার্জনও করেন। পরে যার নাম হয় ইভারমেকটিন।

পদার্থবিদ্যা

কণাবাদী পদার্থবিদ্যার জগতে যুগান্তকারী গবেষণার জন্য ২০১৫ সালে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হল কানাডার আর্থার ম্যাকডোনাল্ড ও জাপানের তাকাকি কাজিতাকে। পদার্থবিদদের কাছে 'ভূতুড়ে কণা' হিসেবে পরিচিত নিউট্রিনোরও ভর আছে, গবেষণায়

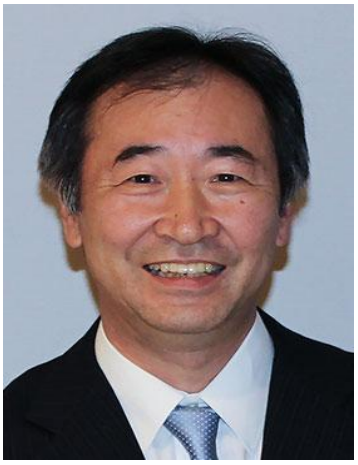

নিঃসংশয় ভাবে এই সত্য প্রমাণ করার জন্যই কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় ও টোকিয়োর ইনস্টিটিউট ফর কসমিক রে রিসার্চের গবেষককে সম্মানিত করা হল। দু'জনেরই গবেষণার বিষয় এক। কণাবাদী পদার্থবিদ্যায় এমন আবিষ্কার যে অতীতের দিকপাল কণাবাদী পদার্থবিদ পল ডিরাক বা আরউইন শ্রডিংগারকেও গর্বিত করত তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের। এই বিশ্বে ফোটন কণা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। আলোর কণা বা ফোটনকে বাদ দিয়ে এ পর্যন্ত পরমাণুর চেয়েও ছোট যত ধরণের কণার অস্তিত্ব জানতে পেরেছেন পদার্থবিদরা তার মধ্যে নিউট্রিনো নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংখ্যায় দ্বিতীয় হলেও কিছুতেই সঠিক ভাবে শনাক্ত করা যাচ্ছিল না এদের। সহজ করে বলতে গেলে, বায়ুমণ্ডলের বিশাল চাপ যেমন আমরা অনুভব করতে পারিনা তেমনই লক্ষ কোটি নিউট্রিনোর আঘাতও আমরা বুঝতে পারিনা। তাই নিউট্রিনোকে বিজ্ঞানীরা 'ভূতুড়ে কণা' আখ্যা দিয়েছিলেন। এদের চরিত্র বোঝার চেষ্টা চলছিল সেই বহুদিন ধরেই তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের হাত ধরে। কিন্তু, বাস্তবে এই কণার অস্তিত্ব আছে, না কি নিতান্ত হিসেব মেলানোর জন্যই এমন কণার উপস্থিতি কেবলমাত্র তত্ত্বগত ভাবে মেনে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা – তা নিয়ে এতদিন কম বিতর্ক হয়নি। সব বিতর্কের অবসান হল ম্যাকডোনাল্ড ও কাজিতার গবেষণায়, এমনই মনে করা হচ্ছে।

গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের ঘটনা। বিশেষ এক তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়ার শক্তির হিসেব মিলছিল না কিছুতেই। উলফগ্যাং পাউলি এই শক্তির হিসেবের গরমিল দূর করার জন্য এক বিশেষ ধরনের কণার অস্তিত্ব কল্পনা করেন যার বাস্তব উপস্থিতি প্রমানিত হয় প্রায় ২৫ বছর পর ফ্রেডেরিক রেনস ও ক্লাইড কাওয়ান-এর গবেষণা। ম্যাকডোনাল্ড ও কাজিতার গবেষণা আসলে এর পরবর্তী ধাপ। সূর্যে প্রতিনিয়ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে আর এই প্রক্রিয়ায় কণা হিসেবে পাওয়া যায় নিউট্রিনো। সূর্য থেকে আলো ও তাপের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে চলে আসে এই ভূতুড়ে কণারা। কিন্তু মজা এবং একই সঙ্গে রহস্য হ'ল যে পরিমাণ নিউট্রিনো যাত্রা শুরু করছে সূর্য থেকে তার থেকে অনেক কম পরিমাণ নিউট্রিনো এসে পৌঁছায় পৃথিবীতে। এই প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রেই বাকি সকলকে টেক্কা দিলেন এবারের নোবেল প্রাপকরা। নিউট্রিনো তিন ধরনের। ইলেকট্রন নিউট্রিনো, টাউ নিউট্রিনো এবং মিউ নিউট্রিনো। সূর্য থেকে যাত্রা শুরু করে ইলেকট্রন নিউট্রিনো কিন্তু পথিমধ্যে ইলেকট্রন নিউট্রিনো বদলে যায় টাউ এবং মিউ নিউট্রিনোতে। ফলে পৃথিবীতে পরিমাপ করলে স্বভাবতই অনেক কম পরিমাণ নিউট্রিনো পাওয়া যায়। আর এখানে স্বতসিদ্ধ হ'ল নিউট্রিনো হতে হবে ভরযুক্ত কণা। আর দুই বিজ্ঞানী প্রমাণ করে দিয়েছেন, যত সামান্যই হোক না কেন, ভর আছে নিউট্রিনোর। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমির অভিমত, দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা নিউট্রিনোর প্রকৃতি বুঝতে অপরিহার্য এবং এই গবেষণার ফলেই আমাদের পক্ষে আরও দৃঢ় ভাবে বস্তুর প্রকৃতি এবং বস্তু ও শক্তির পরস্পরে রূপান্তর হয়ে যাওয়ার আরও নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হল। শুধুই যে বস্তু ও শক্তির প্রকৃতি বুঝতে এই গবেষণা অমূল্য তা-ই নয়, একই সঙ্গে বিশ্বে সৃষ্টিরহস্য বুঝতেও নিউট্রিনোর বিশেষত্ব অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আনুমানিক ১,৩৭০ কোটি বছর আগে যে মহাবিস্ফোরণ দিয়ে জগতের উত্পত্তি, সেই বিস্ফোরণের সময়ই আলোর কণা বা ফোটনের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছিল নিউট্রিনোও। কিন্তু, তারপর সেই নিউট্রিনো কী ভাবে রূপ বদলে এক কণা থেকে অন্য ধরনের কণায় পরিণত হল এবং মহাবিশ্ব বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছল, সেই বিবর্তন বোঝার কাজটি অনেকটাই সহজ করে দিলেন ম্যাকডোনাল্ড ও কাজিতা।

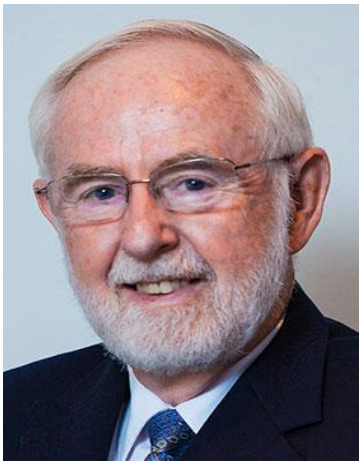

রসায়নবিজ্ঞান

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (DNA)-র এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধান করায় এবছর রসায়ন বিভাগের নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন বিজ্ঞানী - সুইডেনের টমাস লিন্ডাল, মার্কিন পল মড্রিক ও তুরস্ক বংশোদ্ভূত মার্কিন রসায়নবিদ আজিজ সিনকার। 'জীবজগতের ভিত্তি' হিসেবে পরিচিত DNA ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণীদেহের কোষগুলি কী ভাবে তার মেরামত করে তা জানা গেল এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণাতেই।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনে প্রাণীদেহে তৈরি হয় জিনোম। আর এই জিনোম ভেঙ্গে গিয়ে তৈরি হয় DNA-র প্রতিলিপি। তৈরি হয় নতুন ক্রোমোজোম সেট। শুরু হয় কোষের বিভাজন যা কিনা একটি প্রাকৃতিক জীবজ পদ্ধতি। কোষ বিভাজিত হয় বলেই জীবের পরিবর্তন ঘটে এবং সম্ভব হয় বিবর্তন। এই বিবর্তনের পথে, বংশগতির একক,জিন, এক কোষ থেকে অন্য কোষে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বয়ে চলেছে। আর এই জিন-ই ঠিক করে আমরা কেমন দেখতে হব, আমাদের শারীরিক গঠন কেমন হবে বা আমাদের কোন পারিবারিক অসুখ থাকবে কিনা। কিন্তু, এই পদ্ধতি খুব সহজে এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বহুক্ষেত্রেই DNA-র অস্বাভাবিকতার জন্য কোষের অপমৃত্যু ঘটে। অস্বাভাবিকতার আর একটি কারন হ'ল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি দেহকোষের DNA-কে আক্রমণ করতে পারে। আক্রমণ করতে পারে ক্যানসার জনিত কোষ। ফলে প্রভাব পড়ে DNA-এর প্রতিলিপি গঠনে। কিন্তু, DNA-র এই অস্বাভাবিকতা দেখা গেলেও এর গঠন ভেঙ্গে পড়ছে না। এই অস্বাভাবিকতা সারিয়ে ফেলে কোষগুলিই। কী ভাবে? লিন্ডাল, মড্রিক ও সিনকারের গবেষণা তারই উত্তর দিল।

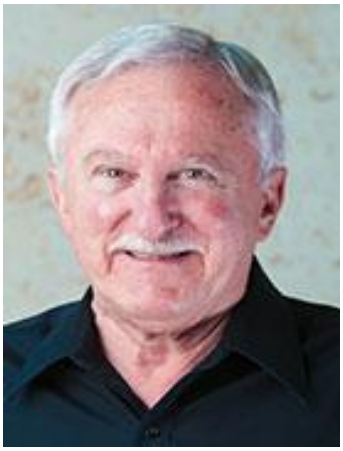

বিজ্ঞানীমহলে এরকম একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে DNA অত্যন্ত স্থিত, এর গঠনে অদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা নেই কোন। কিন্তু, লন্ডনের ফ্রান্সিস ক্রিক ইন্সটিটিউট-এর বিজ্ঞানী লিন্ডাল প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন যে DNA-এর গঠন নানা কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুরু হয় অনুসন্ধান। এই গবেষণায় লিন্ডাল একটি উৎসেচক চিহ্নিত করেন। ক্ষতিগ্রস্ত DNA-র মেরামতি সম্ভব হয় এই উৎসেচকের সক্রিয়তাতেই। নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আজিজ দেখিয়েছেন, কী ভাবে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত DNA গুলিকে প্রাণীদেহের কোষগুলি সারিয়ে ফেলতে সমর্থ হয়। এছাড়াও তিনি লিন্ডাল প্রস্তাবিত উৎসেচকের অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক ব্যবস্থাপনার সবিস্তার মানচিত্র তৈরি করেন। আর হাওয়ার্ড হিউ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট-এর গবেষক মড্রিকের গবেষণার বিষয় ছিল, কী ভাবে ভিন্নধর্মী একজোড়া DNA পরস্পরের জখম সারিয়ে তোলে তা নিয়ে। কোষ বিভাজনের সময় DNA-এর প্রতিলিপি গঠনকালে যে অসদৃশতা দেখা যায় তা কোষ কিভাবে সারাই করে, মড্রিক তারই সন্ধান দিয়েছেন।

দুনিয়ার তিন প্রান্তে বসে তিন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন DNA মেরামতির তিনটি জটিল ধাপ। তিনটি ধাপ মেলাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল গোটা পদ্ধতিটি। রসায়নবিদ ও শারীরবিদ্যার বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে জানার ফলে জীবরসায়নতত্ত্বের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল গবেষকদের সামনে। রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমির মতে, লিন্ডাল, মড্রিক ও সিনকার-এর গবেষণা জীবিত কোষগুলি কিভাবে কাজ করে, শরীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন বুড়িয়ে যায়, পারিবারিক রোগ বংশপরম্পরায় কিভাবে সঞ্চালিত হয় তারই ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং কর্কট রোগের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করছে।

তথ্যসূত্র

১। www.nobelprize.org

২। এইসময়

৩। আনন্দবাজার পত্রিকা

৪। বর্তমান